বঙ্গবন্ধু এক সম্মোহনী নেতা

পাশা মোস্তফা কামাল

নিজের ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও যুক্তি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না। যাদের থাকে তাঁরা অনন্য, তাঁরাই সমাজের কাছে হয়ে ওঠেন অনুসরণীয়। সেই ব্যক্তিত্ব এবং আবেগের উপজীব্য যদি হয় সাধারণ মানুষের কল্যাণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করা, আর একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও কর্মকৌশল- তাহলে সেই মানুষ হয়ে ওঠেন অবিসংবাদিত ও অপ্রতিরোধ্য নেতা। নেতৃত্বের যে কয়েকটি গুণ একজন নেতাকে সম্মোহনী শক্তি প্রদান করে তার সবগুলোই ছিল বঙ্গবন্ধুর মানস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে অসাধারণ কিছু কথা বলেছেন। "নেতৃত্বের উৎকৃষ্টতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হচ্ছি। কবিগুরু ১৯২১ সালে স্কটল্যান্ডের স্থপতি স্যার প্যাট্রিক গিডার্সকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি কোনো এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন- `I do not have faith in any institutions, but in the people who think properly, feel lovely and act rightly.' 'কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার আস্থা নেই, তবে আস্থা আছে সেই মানুষগুলোর ওপরে যাদের চিন্তা যথার্থ, অনুভব মহান এবং কর্ম সঠিক' । এই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শুধু একজন আদর্শ নেতাই ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। কারণ তাঁর চিন্তা ছিল যথার্থ, অনুভব ছিল মহান, আর কাজ ছিল সঠিক।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হতে থাকে। এ কথা আজ সবাই জানে, তিনি তাঁর স্কুল জীবনেই স্কুলের সমস্যা নিয়ে অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী (পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর উপস্থাপনভঙ্গি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো নেতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তা না হলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবকে কলকাতায় গেলে দেখা করার কথা বলতেন না। কতটুকুই বা তাঁর বয়স তখন। কথায় বলে সকালের উদীয়মান সূর্যই বলে দেয় দিনটি কেমন হবে। বালক বঙ্গবন্ধুর ভেতর সেই তেজোদীপ্ততা ছিল আলোর বিচ্ছুরণের মতো।

কলেজজীবনেও আমরা দেখতে পাই তাঁর ভেতরের নেতৃত্বগুণ ও সম্মোহনী শক্তি ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কলেজে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই সময় ইসলামিয়া কলেজ ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। তিনি সেখানে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কলেজে কেউ ইলেকশন করত না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হতো। তিনি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতেন তারাই নমিনেশন দাখিল করত। কারণ সবাই জানত তাঁর মতের বিরুদ্ধে কারও জেতার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সাধারণ ছাত্ররা ছিল শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত। 'মুজিব ভাই' যা বলবেন তাতেই তাদের সমর্থন থাকবে, এ রকম একটা ব্যাপার ছিল।

১৯২০ সালে টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ১৯৭১ সালে এসে পাকিস্তানিদের জন্য তৈরি করেছিলেন দাবানল। যে দাবানলে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার তক্তপোশ। মাঝখানের সময়গুলো খুব সহজসরল কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না । অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে তাঁকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে। কতখানি ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা আর নেতৃত্বের সঠিকতা থাকলে সেটা সম্ভব, ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে।

সহকর্মী ও সহপাঠীদের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ১৯৩৮ সালে ছাত্রাবস্থায় প্রথম কারাবরণ করেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর সহাপাঠী আবদুল মালেককে হিন্দু মহাসভার লোকজন ধরে নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান। তৈরি হয় হাঙ্গামা। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে যান। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। কোথাও কোনো অন্যায় দেখলে সবার আগে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সারাজীবন তাই করেছেন। মানুষকে অসম্ভব ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে তিনি বলেছিলেন তাঁর যোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে ভালোবাসেন' , তাঁর অযোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে বেশি ভালোবাসেন' । কতখানি আবেগপ্রবণ মানুষ হলে মানুষের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকতে পারে তা শুধু অনুধাবন করার বিষয়।

বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। অসীম সাহসী আর দূরদর্শী। বলেছিলেন, ‘ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও আমি বলবো আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান-একবার মরে দুইবার মরে না’ । পাকিস্তানে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারে তাঁর কক্ষের কাছে কবর খোঁড়া দেখেও বিচলিত হননি এই বীর বাঙালি মহাপুরুষ। শুধু বলেছিলেন আমি মারা গেলে আমার লাশটা আমার দেশের মাটিতে পাঠিয়ে দিও। তাঁর সাহস আর মনোবল দেখে উল্টো ভড়কে গিয়েছিল পাকিস্তানি জান্তারা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরপরই তিনি মনস্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন পাকিস্তানের সাথে আমাদের বনিবনা হবে না। তাঁর চিন্তার প্রখরতা এতো বেশি ছিল যে তিনি তখন থেকেই স্বাধীনতার কথা ভেবে বসে আছেন। তিনি তখনো ঢাকায় আসেননি, কলকাতার বেকার হোস্টেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গীসাথিদের নিয়ে বেকার হোস্টেলে একটি সভা করছিলেন। সেই সভায় তিনি বলেছিলেন, এই পাকিস্তান বাঙালির অধিকার রক্ষা করবে না। তাঁর মুখে উচ্চারিত চিরাচরিত কথ্যবাংলায় বললেন, ‘মাউরাদের সাথে আমাদের হবে না’ । কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার আগেই কলকাতার সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকার অফিসে এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা। কারণ বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা।

বঙ্গবন্ধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগুচ্ছিলেন ৪৭ সাল থেকেই। সেই লক্ষ্য ছিল বাঙালির স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন আবাসভূমি। তিনি তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। ৬৬’ র ছয় দফা আন্দেলনে একটি পরিস্কার গাইডলাইন ছিল স্বাধীনতার। পাকিস্তানি শাসকরা বুঝেতে পেরেছিল তাঁর লক্ষ্য। তারা ষড়যন্ত্র তৈরি করলো। সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিলেন বঙ্গবন্ধু। উত্তাল গণ- আন্দোলনের মাধ্যমে বের হয়ে এলেন কারাগার থেকে। ১৯৬৯ এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন আজ থেকে এই দেশের নাম হবে ‘বাংলাদেশ’ । ৪৭ থেকে ৬৯। এই সময়কালে তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বগুণে বাংলার মানুষের মনে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মাত্র আঠারো মিনিটের ভাষণ। উত্তাল মার্চ একাত্তর। কী মন্ত্র ছিল সেই ভাষণে! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিত হয়ে গেল পুরো জাতি। এক আঙুলের ইশারায় উঠে এলো সহস্র বছরের ইতিহাস। শৃঙ্খল ভাঙার দৃঢ় প্রত্যয়। ভাষণ দেওয়ার এই ভঙ্গি, কথা বলার এই কাব্যিক উপস্থাপনা বিশ্বের আর কোনো নেতার মধ্যে আমি দেখিনি। প্রবল ব্যক্তিত্ব চেহারার সাথে বক্তব্যের প্রতিটি স্বর প্রক্ষেপণ যেন বাঘের মতো গর্জন করছিল। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ছিল একেকটি কবিতার চরণ। তাইতো তিনি ‘রাজনীতির কবি। ছিল বৈষম্যের ইতিহাস, ছিল দিক নির্দেশনা। পুরো বাঙালি জাতি এক আঙুলের ইশারায় একতাবদ্ধ হয়ে গেলো। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নজির নেই।

বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন দেশকে, দেশের মানুষকে। কত প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকলে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন ‘কী চাস তোরা’ । তাঁর বিশ্বাসের মাত্রা এত প্রবল ছিল যে তিনি কখনো ভাবতেই পারেননি যে কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সেই কুলাঙ্গারগুলো যে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা সেটা বুঝতে বুঝতে তিনি চলে গেলেন এই জগৎসংসার ছেড়ে। বাঙালির এই ক্ষতি আরো হাজার বছরেও পূরণ হবে না, হবার নয়। বঙ্গবন্ধুর মতো সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতা হাজার বছরেও একজন জন্মায় কি না সন্দেহ আছে।

তারিখঃ ২২.০৮.২১ পিআইডি ফিচার